Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-2 January 2024

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাসে কদর্যতার মধ্যেও সৌন্দর্যের প্রতিফলন

অনামিকা ঘোষ

Link : https://bit.ly/42aflxe

সারসংক্ষেপ : নিতাই চোর ডাকাত বংশের জন্মগ্রহণ করে, কীভাবে কবিয়াল হয়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে নিম্নশ্রেণি দেহব্যবসায়িনী ঝুমুর দলের নারী-পুরুষের কুৎসিত সৌন্দর্য মিলেমিশে যে জীবনকাহিনি ফুটে উঠেছে তারই বাস্তবিক প্রতিফলন এই ‘কবি’ উপন্যাসে।

সূচক শব্দ : বিস্ময়, ডোম সম্প্রদায়, ঝুমুর সম্প্রদায়, প্রেম তত্ত্ব, নিম্নশ্রেণি, ব্যবসা

তারাশঙ্করের ‘কবি’ উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতার যে ছবি আমরা লক্ষ্য করি তা তিনি সমাজের নিচু তলার মানুষের মধ্যে থেকে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সংগ্রহ করেছেন। বীরভূমের অন্ত্যজ ডোম পরিবারের সন্তান নিতাই কিভাবে একজন কবি হয়ে উঠেছে তাই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নিতাই যে বংশে, যে পরিবেশে জন্মেছে, বড়ো হয়েছে, পুরুষানুক্রমে তারা সবাই চোর, ডাকাত, খুনি। তাই তারও ওই রকম কিছু একটা হওয়া ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু নিতাই হয়ে উঠেছে পাঁকে ফুটে ওঠা পঙ্কজ। লেখক এর ভাষায় যেন দৈত্য বংশে প্রহ্লাদ। চৌর্য বৃত্তির প্রতি তার ছিল প্রবল ঘৃণা। তাই সে ঘনশ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়িতে মাহিন্দারির কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সে কুলি গিরি করে আর মুখে মুখে পদ রচনা করে, স্বপ্ন দেখে কবিয়াল হওয়ার। এক সময় রাজার শ্যালিকা ঠাকুরঝির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুরঝি নিতাইকে দুধ দিতে আসে আলাপ পরিচয় হয়। ক্রমে তারা গভীর প্রণয়ে বাঁধা পড়ে। এ প্রণয় যখন গাঢ়তর তখন নিতাইয়ের মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কারণ ঠাকুরঝি পরস্ত্রী, তাকে ভালোবাসা অন্যায়, অপরাধ। তাই নিতাই দূরেই থেকেছে। ঠাকুরঝি সম্বন্ধে নিতাই তার একটি গানে বলেছে, “চাঁদ তুমি আকাশে থাক — আমি তোমায় দেখব খালি/ছুঁতে তোমায় চাই নাকো হে — সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।”[১]

তার প্রেম পরস্পরের পিপাসা তৃপ্তির প্রেম নয় — সকল পিপাসা জয় করার প্রেম। তাই সে ঠাকুরঝির প্রতি একটি অতি মধুর প্রীতির ব্যথায় উন্মনা হয়ে উঠলেও তার কল্যাণ কামনা করে সে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ঠাকুরঝির গায়ে কোনোরকম কালি লাগতে দেয় নি। এই ঠাকুরঝি তাকে গান ও পদ রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। ঠাকুরঝি তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রেমকে জয়ী করেছে — “ঠাকুরঝি মারা গিয়েছে নিতাইয়ের প্রেমে পাগল হয়ে। তবে ঠাকুরঝি বেঁচে ছিল নিতাইয়ের মনে শুধু স্মৃতিতে বেদনায়, গানে।”[২]

এরপর উপন্যাসের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে ঝুমুর দলের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে চারটি নারী ও কতকগুলি পুরুষ চরিত্র দেখা যায়। তবে নারীরা দেহ-ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে প্রধান হলো মাসি। তার মুখে সর্বদাই হাসি লেগেই থাকে। গান, ছড়া, অনর্গল মুখস্ত বলে যায়। সে এ দলের কর্ত্রী। মাসী কখনো খুব রূঢ় আবার কখনো তাকে হাসিখুশি ইয়ার্কি করতে দেখা যায়। মাসির একমাত্র লক্ষ্য হলো রোজগার বা উপার্জনের দিকে। যে উপার্জন করতে পারে না মাসির কাছে তার কোনো মূল্য নেই। দল থেকে সরিয়ে দিতে তার এতটুকু দ্বিধা থাকে না। বসন্ত এক সময় বলেছে — “এই নাগরেরা, যাও, চলে যাও তোমরা। আর আমোদ নেহি হোগা।”[৩] একথা শুনে মাসি শশব্যস্ত হয়ে বসনের হাত ধরে বলেছে — “এই বসন! বসন। ছিঃ করছিস কি? খদ্দের লক্ষ্মী — তাড়িয়ে দিতে নাই।”[৪] খেউড় গানের আসরে নিতাই যখন আসর জমাতে পারেনি তাদের থালায় প্যালার পরিমাণ খুব কম হলে প্রৌঢ়া মাসি নিতাইকে বলেছে — “রং চড়াও, ওস্তাদ, রং চড়াও।”[৫] এই ভাবে মাসি উপার্জনের পথটিকে সচল রাখে। দেহ ব্যবসায়ী লোকজন এলে মেয়েদের ডেকে দেখায়, দরদস্তুর করে, টাকা আদায় করে, গোপনে মদ বিক্রি করে। বসন্ত যেদিন দেহের খরিদ্দারের সঙ্গে ঝগড়া করে বলে আমার ঘরে লোকের দরকার নাই তখন মাসি রূঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় — “বেশ কাল সকালে তুমি ঘর চলে যেয়ো! আমার এখানে ঠাঁই হবে না।”[৬] শুধু বসন্ত নয়, এমন কাজে মাঝে মাঝে নির্মলা, ললিতাও ক্লান্ত হয়ে পড়লে মাসির ওই একই উত্তর — “তাহলে বাছা তোমাদের নিয়ে দল চলবে না, তোমরা পথ দেখো...।”[৭]

মাসির আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে নতুন পথ ধরে, মেয়েদের সাজগোজ করিয়ে গাঁয়ের বাজারে বেড়াতে নিয়ে যায়, বাজারের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। এই মেয়েদের দেহ বেসাতির এক ভাগ মাসির প্রাপ্য, গানের আসরেও তাই। কোনো লোক এলে মাসি আদর সম্ভাষণে ঘরে আনতে আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি রাখে না। মাসির আদেশ উপেক্ষা করার মতো ক্ষমতা দলের কারোর নেই। তাই ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সেজেগুজে অভ্যাসের নেশায় মেতে ওঠে, কটাক্ষ করে মুচকি হেসে অচেনা অজানা লোকটির হাত ধরে ঘরে আনে, এইরকম কদর্য জীবনযাপনের ফলে দারুণ যৌন ব্যাধির শিকার হয় তারা। ক্রমে মৃত্যুর পথে ঢলে পড়ে। এইভাবেই করুণ মৃত্যু হয় বসন্তের। বসন্তকে চিতায় তোলার আগে মাসি তার গায়ের গহনা খুলে নিলে নিতাইয়ের প্রশ্নে মাসি চির সত্য কথাটি বলেছিল — "বুকের নিধি চলে যায় বাবা, মনে হয় দুনিয়া অন্ধকার, খাদ্য বিষ আর কিছু ছোঁব না...।"[৮] এক সময় মাসি নিতাইকে নিজের দলে আসতে বলেছে, তাকে আশীর্বাদ করেছে — "তুমি চিরজীবী হও। মাসী ছেড়ে আজ তোমার সঙ্গে মা বেটা সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছে করছে। তাহলে শেষকালটার জন্য আর ভাবনা থাকে না।"[৯] এখানেই মাসি পাঠকের হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। পুরো উপন্যাসটির মধ্যে যতই মাসির নির্মম দিকটি দেখা যাক না কেন, জীবনের অভিজ্ঞতায় পাকাপোক্ত সে। হয়তো জীবনযাপনের প্রয়োজনে তাকে নির্মম হতে হয়েছে তবে শেষের কয়েকটি ঘটনায় সে সমস্ত কঠোরতা ছাড়িয়ে নরমে-কঠিনে মিলে এক সজীব নারীসত্তা হয়ে উঠেছে।

আবার ঝুমুর দলের দুটি মেয়ে ললিতা ও নির্মলা, এরা দুজনেই দেহ-ব্যবসায়িনী। দুজনেই হাসি, ঠাট্টা, রসিকতায় নিপুণ। দুজনেই বসন্ত ও নিতাইকে নিয়ে রসিকতা করে তবে সে রসিকতায় কোনো ঝাঁঝ ছিল না। প্রথম দেখাতেই নিতাইকে নির্মলা আপন করে নিয়েছিল। চা করে দিয়েছিল। মাসির কথায় নিতাই হয়েছিল নির্মলার দাদা আর ললিতা ঠাকুরজি সম্বন্ধ পাতিয়েছিল। নিতাইয়ের অসুস্থতায় সে সেবা করেছে — "মাথা ধরেছে নয় গো দাদা? তুমি শোও, আমি খানিক মাথা টিপে দি।" নির্মলার নরম ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে নিতাইয়ের ভারি আরাম বোধ হয়। কখনো কখনো নির্মলা নিতাইকে ডাকে — "এসো গো দাদা, গরিব বুনের ঘরে একবার এস।"[১০] ললিতা নির্মলা নিতাই বসন্তকে নিয়ে ঠাট্টার বাকি রাখে না। বসন্ত যে একদিন নিতাইকে দেখে মুখ বাঁকিয়ে ঘৃণা করেছিল সে কথায় তারা ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চায়। এরা দুজনে মিলে নিতাইয়ের নাম দিয়েছিল 'বসন্তের কোকিল'। নিতাই একসময় বলেছে — নির্মলা মায়ের পেটের বোনের মতোই ভালো। আর ললিতার ঠাট্টাগুলি তার কাছে শ্যালিকার মুখের মতোই মিষ্টি ছিল। ঝুমুর দলের এই নিম্ন শ্রেণির দেহ-ব্যবসায়ীদের অন্তরের অন্তঃস্থলে যে স্নেহ ভালবাসার ফল্গুধারা নিরন্তর বহে চলেছিল নিতাই সব সময় তা অনুভব করেছে। যা পাঠককে ও মুগ্ধ করে।

উপন্যাসের অধিকাংশ অংশ জুড়ে রয়েছে ঝুমুর দলের প্রধান নায়িকা বসন্ত। এই দলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও রূপ এবং সৌন্দর্যের অধিকারী শুধু তাই নয়। সে কৃশতনু গৌরাঙ্গী, ক্ষুরধার শানিত ছুরির ধারের মতো দুটি বড়ো বড়ো চোখ সর্বদাই চঞ্চল। বসন্ত যখন হাসে তখন মনে হয় সে সর্বাঙ্গ ভরে হাসে সেই হাসির ধারে — "মানুষের মনকে টুকরা টুকরা করিয়া ধুলায় ছুঁড়িয়া ছিটাইয়া ফেলিয়া দেয়।"[১১] তার নাচে ও গানে এক অপরূপ অঙ্গভঙ্গিমা আছে যা দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হয়। এই দলের মধ্যে প্রত্যেকের একটি করে প্রেমাস্পদ ছিল কিন্তু বসন্তের মনের মানুষ কেউ ছিল না। সেজন্যই হয়তো সে কিছু রূঢ় ও তার কথাবার্তাও ছিল ঝাঁঝালো ধারালো। সে নিম্ন স্তরের দেহ-ব্যবসায়ী। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় আর দেহের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করে। অনেক পুরুষের সান্নিধ্য ঘটেছে তার জীবনে। কিন্তু তার মনের মানুষ কেউ হতে পারেনি — "কারণ তাহাদের দেহ ও রূপের অহংকারকে পুরুষেরা আসিয়া অর্থের বিনিময়ে পায়ে দলিয়া যায়। পুরুষের পর পুরুষ আসে দেহ ও রূপকে এতোটুকু সম্ভ্রম করে না, রাক্ষসের মত ভোগ করে চলিয়া যাইবার সময় উচ্ছিষ্ট পাতার মতো ফেলিয়া দিয়া যায়।"[১২] নিতাইকে পেয়ে তার শূন্য হৃদয় পূর্ণ হয়েছে। তার হৃদয়ে যে গোপন বাসনা ছিল তা চরিতার্থ করতে চেয়েছে নিতাইকে দিয়ে। এর মধ্যে কখনো এই মেয়েগুলির ঘৃণ্য জীবন যাপনে অনীহা দেখা দেয়। অনিয়মিত উছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্লান্ত হলে যে ওদের চলে না, পুনরায় বেশভূষা করে মদ খেয়ে শরীরের বিনিময়ে উপার্জন করতেই হয়। তার উপর মাসির কড়া শাসন এবং দল থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি, যা কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। বসন্ত বা বসন্তদের মতো মেয়েদের কেনই বা এ পথ বেছে নিতে হলো কে জানে! হয়তো বা বাধ্য হয়েই এ পথে নামতে হয়েছে তবে বসন্তদের মতো মেয়েরা যে কারণেই এ পথে আসুক না কেন তাদের এই কদর্য জীবনযাপনের মধ্যেও এমন কিছু শিক্ষা এমন কিছু সংস্কৃতি রয়েছে যা দেখে অবাক হতে হয়। ঝুমুর, খেউর, নগ্নজীবনের প্রমত্ত তৃষ্ণার গান তো তাদের গাইতেই হয়। তার মধ্যেও তারা পুরাণ রামায়ণ পদাবলি পাঁচালি ব্রতকথাও জানে। লক্ষ্মীপূজার দিন নিকানো উঠানে লাল পেড়ে তসরের শাড়ি পরে পূর্ণিমার বৃহস্পতিবারে বারোমাসে লক্ষ্মীপূজো করে তারা — এসব দেখে নিতাই ভেবেছিল, এতদিন মেলামেশা করেও সে জানতে পারেনি যে তাদের মধ্যেও ধর্মকর্ম আছে। সমস্ত দিন উপবাস করে নিষ্ঠার সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় ফলমূল, সন্দেশ, দুধ, দই, নানা উপচারে ধূপদীপ সহযোগে পরম ভক্তির সঙ্গে লক্ষ্মীপূজো করে। পুজো শেষে লক্ষ্মীর ব্রতকথা ব্রত শেষে হুলুধ্বনি দিয়ে প্রণাম করে আপন ঘরে যায়। "বসনের এই নতুন রূপ দেখিয়া নিতাই

মুগ্ধ হইয়া গেল; সেই বসন এমন হইতে পারে।"[১৩] বাজারে রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পথে বসে থাকা ভিখারিদের জন্য খুচরো পয়সা দান করেছে বসন যা দেখে নিতাই বলেছে — "ভাবছি তোমাকে চিনতে পারলাম না।"[১৪] কানা খোঁড়া ভিখারিদের কথা বলতে গিয়ে বসন্তের চোখ জলে ভরে ওঠে। আজ আর বসন্তকে দেখে নিম্ন শ্রেণির স্বৈরিনী বলে মনে হয় না — সে এখন নিষ্ঠাবতী পূজারিণী।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিখুঁত দৃষ্টি আর গভীর মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এই মেয়েটির নাম বসন্ত রেখে। বসন্ত সুন্দরের প্রতীক। নতুন সৃজনের প্রতীক। বিভিন্ন রঙের প্রতীক। বসন্তে যেমন শুকনো ডালেও ফুটে ওঠে রংবেরঙের ফুল সেই রকমই ঠাকুরঝিকে হারিয়ে নিতাইয়ের ব্যথাজীর্ণ মনে ফুল ফুটিয়েছে বসন্ত। বসন্তের অনুপ্রেরণায় নিতাই কত আশ্চর্য নতুন পদ রচনা করেছে, ঝুমুর দলের মেয়েদের লক্ষ্মীর ব্রতকথা শুনে তার মধ্যে রস প্রবাহিত করে পয়ার ছন্দে অনন্য রূপদান করেছে। প্রকৃতিতে যেমন চলে ঋতু বদলের পালা সেই রকমই এক সময় বসন্তকে চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু রূপে গুণে মুখরা নিম্ন শ্রেণির দেহ-ব্যবসায়ী বসন্ত সব কিছু কদর্যকে ছাড়িয়ে সুন্দরের প্রতীক হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কবি উপন্যাসটিতে যে চরিত্রগুলি ব্যবহার করেছেন তাদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন তাই তিনি এত জীবন্তভাবে তাদের পরিচয়, জীবনযাপনের রীতিনীতি গুলি তুলে ধরতে পেরেছেন। সাধারণত মানুষের মনের মধ্যে কিছু অন্ধবিশ্বাস, কিছু ধারণা থাকে যেগুলি তারা বহুদিন থেকে বহন করে। ঝুমুর বা খেউর গান বা এ ধরনের গান যারা গায় বা তাদের দলের লোকজনদের সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনে একটা কদর্য বা বিরূপ মনোভাব রয়েছে, আসলে আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায় তার অন্তরালেও কিছু লুকিয়ে থাকে যা সবার চোখে পড়ে না, সেই কথাই ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

তথ্য সূত্র :

১। 'কবি', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ত্রিংশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ. ৬০ (অতঃপর 'কবি' নামে উল্লিখিত)
২। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ৮২
৩। 'কবি', পৃ. ৯৫
৪। ওই, পৃ. ৯৫
৫। ওই, পৃ. ১০৪
৬। ওই, পৃ. ১৩৪
৭। ওই
৮। ওই, পৃ. ১৪৭
৯। ওই, পৃ. ১৪২
১০। 'তারাশঙ্করের কবি : তত্ত্বে ও সৃজনে', ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০০০, পৃ. ৮৩
১১। 'কবি', পৃ. ১১৩
১২। ওই, পৃ. ১১৬
১৩। ওই, পৃ. ৬৫
১৪। ওই, পৃ. ১০৪
১৫। ওই, পৃ. ১০১
১৬। ওই, পৃ. ১১৭

লেখক পরিচিতি :

অনামিকা ঘোষ : জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড নিবাসী। কবি ও প্রাবন্ধিক।